সূচিপত্র

ভূমিকা
ক্যারিয়ার কী?
পুঁজিবাদ
ইসলামে রিযিকের ধারণা
» রিযিক শুধু বস্তুগত বিষয় নয়
» যে রাস্তাগুলো দিয়ে রিযিক আল্লাহ পৌঁছান
» রিযিক অপরিবর্তনীয়
» বস্তুগত জীবিকা উপার্জনের বিধান
» কতটুকু উপার্জন ফরজ
» নবিদের (আলাইহিমুস সালাম) জীবিকা
» নবিজি সা.-এর জীবিকা
» সাহাবিদের জীবিকা ৭
» সাহাবিদের জীবনযাপনের ধরন
» সঞ্চয়
» সঞ্চয় ও অতিরিক্ত আয়ের প্রয়োজনীয়তা

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি : ইসলামের মূল বার্তা
» দুনিয়া বনাম হায়াতুদ-দুনিয়া
» ইসলাম হচ্ছে মধ্যপন্থা

পুঁজি বনাম পুঁজিবাদ
» ক্যারিয়ার বনাম ক্যারিয়ারিজম

ইসলামে সম্মানের ধারণা
ব্যবসা
বোনদের ক্যারিয়ার
» ভিক্টোরিয়ান যুগে নারী (১৮৩৭-১৯০১ খ্রি.)

নারীর ক্যারিয়ারিজম
পড়তে যেহেতু হচ্ছেই
শেষ কথা

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা সাইয়িদিল আম্বিয়ায়ি ওয়াল-মুরসালিন। ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন।

প্রথমত, আমাদের বইয়ের নাম **'মুমিনের ক্যারিয়ার ভাবনা'**। মানে, সাধারণত বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে দেখবেন যে, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং হয়, বিভিন্ন জব অপরচুনিটি নিয়ে কাউন্সেলিং হয়। 'তুমিও জিতবে', 'সময়কে কাজে লাগান' এই জাতীয় কথা বলা হয়। জীবনে উন্নতি করার, নিজেকে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়ার মোটিভেশন দেওয়া হয়। এই বইয়ে আমরা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যারিয়ার ভাবনার দিকে তাকাব।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে 'ধর্ম' নয়, ইসলাম হলো 'দ্বীন'—জীবনব্যবস্থাপনা, Life Management System.[১] সুতরাং আবশ্যিকভাবেই ইসলামে জীবিকা-ক্যারিয়ার-সম্মান বিষয়ে কোনো না কোনো নীতিমালা দেওয়া থাকবে। আমরা দেখব আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জীবিকা ও ক্যারিয়ারের ব্যাপারে কী বলতে চেয়েছেন। একজন মুমিন, যিনি কালিমা পড়েছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ; এই কালিমা পড়ার পরে তার ক্যারিয়ার-ভাবনাটা কেমন হবে? আমরা তো সবাই মুসলিম। আমরা আল্লাহ তাআলার ওপরে ঈমান এনেছি; ঈমানের যে বিষয়গুলো রয়েছে, যেমন, আল্লাহর ওপরে, রাসুলের ওপরে, (আসমানি) কিতাবসমূহ ও আখেরাতের জীবনের ওপরে আমরা ঈমান এনেছি। এখন এই ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার ক্যারিয়ারটা কেমন হওয়া উচিত?

এজন্য সবার আগে আমরা একবার কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করব, ইনশাআল্লাহ—'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ'। একবার কালিমাও পড়ে নিই, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।'

ইসলাম শব্দের অর্থ, আত্মসমর্পণ করা, সাবমিশন অব উইল; মানে, আল্লাহর কাছে

[১] সহিহ বুখারিতে আমরা দেখতে পাই, 'দ্বীন'-এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে সাহাবিদের থেকে 'মিনহাজ' এবং 'শিরাআ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর মিনহাজ অর্থ হলো, পদ্ধতি, সিস্টেম ইত্যাদি। [সহিহ বুখারি, পৃষ্ঠা ১১]—শরয়ি সম্পাদক

আত্মসমর্পণ করা। এখানে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, **আমি যে কালিমাটি পাঠ করলাম, এই কালিমার সামনে আমি আত্মসমর্পণ করেছি কি না।** 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া আর এর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাঝে পার্থক্য আছে।

'ইলাহ' শব্দের তো অনেক অর্থ রয়েছে। ইলাহ শব্দের এক অর্থ তো হলো, আমি যার জন্য ইবাদত করছি, যার জন্য উপাসনা করছি, তিনি আমার ইলাহ। কিন্তু এ ছাড়াও অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। এর মধ্য থেকে একটি হলো—

- সর্বোচ্চ ভালো যাকে বাসা যায়, যার চেয়ে বেশি ভালো আর কাউকে বাসা যায় না।

- সর্বোচ্চ আনুগত্য যার করা যায়, যার ওপরে আর কোনো আনুগত্য হয় না। না কোনো গুরুর, কোনো উস্তাজের, কোনো রাষ্ট্রের, বা মতাদর্শের—কারও আনুগত্যই এর ওপরে হয় না।

ইলাহ শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, যাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভয় করা যায় বা ভয় করতে হয়। মোদ্দাকথা, সর্বোচ্চ ভালোবাসা, আনুগত্য ও ভয় যার প্রতি হয়, যার প্রতি হতে হয়, তিনিই হচ্ছেন ইলাহ।

ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত আমরা পড়াশোনা করে এসেছি স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। **ছোটবেলা থেকে পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন কো-কারিকুলার এক্টিভিটিজের মাধ্যমে (যেমন গান-নাচ-ডিবেইট), টিভি-চ্যানেল, নাটক, সিনেমা, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন চিন্তাধারা-মতাদর্শকে আমাদের মন-মগজে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। ইসলামের আদর্শ-দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই আমার ভেতরে ইনপুট দেওয়া আদর্শ এক তো নয়ই, ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীত। যার কারণে ইসলামের অনেক বিষয়ই আমার কাছে কষ্টকর মনে হয়। ফলে মুখে মুসলিম দাবি করলেও আত্মসমর্পণটা ঠিক হয়ে ওঠে না। আত্মসমর্পণ হচ্ছে—**

- **আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাব কুরআনে মাজিদে যে বিধানগুলো পাঠিয়েছেন,**

- **রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ দিয়ে আমাদের সামনে সেই কুরআন ব্যাখ্যা করেছেন এবং**

- **সেই ব্যাখ্যাকে সাহাবায়ে কেরাম রা. ধারণ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।**

- **এরপর সেই প্রজন্ম তাঁদের পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।**

- **এভাবে প্রত্যেক প্রজন্ম তাদের পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।**

তার কাছে নিজের খেয়ালখুশিকে সঁপে দেওয়া। এটিই হচ্ছে ইসলাম। অর্থাৎ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে **যা পেয়েছেন** এবং সাহাবিদেরকে সেটির **যে ব্যাখ্যা** শিখিয়েছেন, **তা-ই ইসলাম এবং এই ইসলামের কাছেই আমি আত্মসমর্পণ করলাম।**...

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জন্য আল্লাহর কিতাব। আর 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র জন্য রাসুলের সুন্নাহ। এবং আমাদের পরিচয় 'আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'।[২] অর্থাৎ, **আমরা রাসুলের সুন্নাহর অনুসরণ করি এবং সাহাবায়ে কেরামের জামাত যা বুঝেছেন, তার অনুসরণ করি।**

তাই, সবার আগে এই বিষয়টি আমি আপনাদের সামনে স্পষ্ট করলাম যে, আসলে আমাদের আত্মসমর্পণটা হয়ে ওঠে না। **ছোটবেলা থেকে আমরা যেভাবে বড় হয়েছি, যে ধ্যানধারণা, যে পরিবেশ আমাদের মনের মধ্যে চেপে বসেছে, সেটাকে 'সমর্পণ' করতে হবে। অস্ত্র সমর্পণের মতো। কীসের সামনে? আল্লাহ তাআলার কিতাব ও রাসুলুল্লাহর সুন্নাহর সামনে, সাহাবায়ে কেরামের বুঝের সামনে।** তাহলেই আমি ভালোভাবে মুসলিম হতে পারলাম। **আমার এতদিনের লালিত ধ্যানধারণা, এতকাল ধরে বেড়ে ওঠা আমার ব্যক্তিগত বুঝ, মতাদর্শ, বাছবিচার... সবকিছুকে আমি আল্লাহর সামনে ফেলে দিলাম, সমর্পণ করলাম।** আত্মসমর্পণ করলাম যে, ও আল্লাহ! আমার খুশি নয়, বরং আপনার খুশি। আমার মর্যাদা নয়, বরং আপনার মর্যাদা। আমার আদেশ নয়, আপনার আদেশ। আমার নিষেধ নয়, আপনার নিষেধ। আমার জ্ঞান-বুঝ না, বরং আপনার জ্ঞানের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম। এই হচ্ছে মুমিনের ঈমান। আমরা এখন মুমিন। মুমিনের ক্যারিয়ার ভাবনাটি কী হবে, সে বিষয়ে আমাদের আজকের আলোচনা। বিসমিল্লাহ বলে আমরা শুরু করছি।

---

[২] যেমন মুতাজিলা সম্প্রদায় নিজেদের পরিচয় দিত 'আহলুল আদল ওয়াল-আকল'। শিয়ারা ভিন্ন পরিচয় দেয় নিজেদের আহলে বাইতের সাথে সম্পর্কিত করে। মূলত 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ' পরিচয়টি এসেছে রাসুলের হাদিস থেকে। রাসুল বলেন, 'তোমরা **আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহকে** আঁকড়ে ধরো।' [সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৭; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২; হাদিসটি সহিহ]
তিনি আরও বলেন, 'তোমরা জামাতকে আঁকড়ে ধরো। অর্থাৎ **সাহাবা ও মুসলিমদের জামাতের সাথে একমত ও ঐক্যবদ্ধ থাকো**; বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ো না।' [সুনানুত তিরমিজি : ২১৬৫; মুসনাদু আহমাদ : ২৩১৪৫; হাদিসটি সহিহ]
উপরিউক্ত দুটি হাদিসে সুন্নাহ ও জামাতকে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে। অতএব যুগে যুগে যারা এই দুটিকে সঠিকভাবে ধারণ করেছে এবং করে, তারাই মূলত 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ' তথা সুন্নত ও জামাতের ধারক।

ক্যারিয়ার কী?

সবার আগে ক্যারিয়ার মানে কী, সেটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। বিভিন্ন অভিধান থেকে এ শব্দটির অর্থগুলো যেভাবে এসেছে—

- **a profession, occupation** (পেশা), trade (ব্যবসা) or **vocation.** (কর্ম বা বৃত্তি, যার মাধ্যমে মানুষ আয়-উপার্জন করে।)

- the progress and actions you have taken throughout the working years of your life, especially as they relate to your occupation. (আমি কর্মজীবনে যে উন্নতি করলাম, পুরো কর্মজীবনজুড়ে আমার যে প্রমোশন হচ্ছে ক্রমান্বয়ে, একেই বলা হচ্ছে ক্যারিয়ার।)

- the job or series of jobs that you do during your working life, especially if you continue to **get better jobs** and **earn more money.** (যেমন, কেউ একটি চাকরি ছেড়ে আরও ভালো কোনো চাকরি করছে; কেউ একটি স্তরের স্যালারি ছেড়ে আরও উচ্চস্তরের স্যালারির কাজে যাচ্ছে, এ বিষয়টিকেই তারা বলছেন 'ক্যারিয়ার'।)

- doing something **regularly for most of your life** (কর্মজীবনে আমি যে কাজগুলো করি অর্থ উপার্জনের জন্য), especially as your main **way of making money**. (নিয়মিত কোনো একটি কাজ করা, জীবনের অধিকাংশ সময় যার পেছনে ব্যয় হয়। অর্থাৎ, এমন একটি কাজ, দিনের বেশি সময় ধরে আমি যা করি, বা, জীবনের বড় একটা সময়জুড়ে টাকা বা জীবিকা উপার্জনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে আমি যা অবলম্বন করি, তা-ই 'ক্যারিয়ার'।)

আমরা এখানে চারটি সংজ্ঞা থেকে দুটো জিনিস পাই—

১. ক্যারিয়ার হলো টাকা উপার্জনের মাধ্যম।
২. এটি একটি উন্নতি ও সামাজিক সম্মানের বিষয়। বা, কর্মজীবনের শেষে

আয়নার সামনে আমি নিজেকে যেখানে দেখতে চাই, আত্মমর্যাদা, আত্মতুষ্টি ও আত্মতৃপ্তির যে জায়গায় আমি নিজেকে দেখতে চাই, সেটিই হলো ক্যারিয়ারের মূল লক্ষ্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ক্যারিয়ারের মূল লক্ষ্য দুটি—

এক. টাকা উপার্জন করা।

দুই. নিজের উন্নতি ও আত্মমর্যাদা অর্জন করা।

মানে, ক্যারিয়ারের টাকা ও সম্মান অর্জনের সঙ্গে এখানে আরেকটি বিষয়ও কাজ করে, **'ওপরে ওঠার প্রবণতা'**; আরও ওপরে উঠব, তো আরও বেশি টাকা, আরও বেশি সম্মান। এটাকে আমরা বলব 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা', 'পার্থিব প্রতিযোগিতা'।

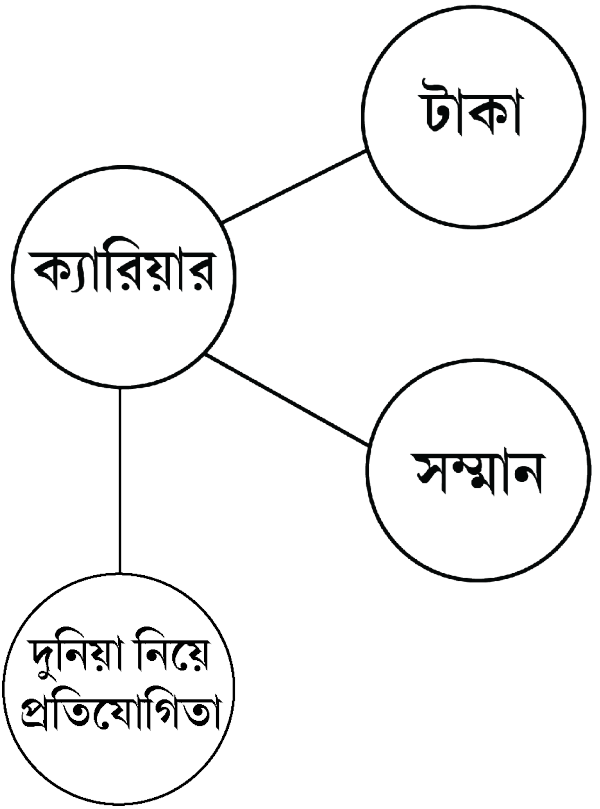

পুঁজিবাদ

টাকা উপার্জনের সঙ্গে যে সম্মানের একটা সম্পর্ক, এ বিষয়টি (বা ধারণাটি) দুনিয়ায় কবে থেকে শুরু হলো? মাছ জন্মায় পানিতে। পানি তার জন্য স্বাভাবিক বিষয়। সে ভাবে, সারা দুনিয়া বুঝি পানিই। আমরা যে পরিবেশে বড় হই, মনে করি, সব যুগে বুঝি এমনই ছিল; পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে সবকিছু বোধ হয় এরকমই ছিল।

জন্মের পর থেকেই আমরা দেখেছি, দোকানে গিয়ে এক টুকরো কাগজ দিলে, একটি চকলেট পাওয়া যায়। কাগজের নোটের বিনিময়ে পণ্য পাওয়া যায়—এর বাইরে অন্য কোনো সিস্টেম আমরা দেখিনি। জন্মের পর থেকে আমরা দেখে আসছি, প্রতি পাঁচ বছরে একবার ভোট হয়ে কেউ একজন ক্ষমতায় আসে। পাঁচ বছর পরে আবার একটা ভোট হয়, আবার নতুন একটি সরকার গঠিত হয়। আমাদের কাছে মনে হয়, এই পদ্ধতিই বুঝি শ্রেষ্ঠ, এটিই ধ্রুব; এর চেয়ে ভালো কিছু আর হতে পারে না; পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে হয়তো এমনই ছিল; এটিই স্বাভাবিক। অর্থাৎ, বাতাসের মধ্যে থাকতে থাকতে আমাদের কাছে বাতাস যেমন স্বাভাবিক হয়ে যায়, আমরা আলাদা কিছু অনুভব করতে পারি না, ঠিক একইভাবে, এ বিষয়গুলোও আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হয়।

ঠিক তেমনইভাবে ছোটবেলা থেকে যে ধ্যানধারণা আমরা শিখে এসেছি—'পড়ালেখা করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে', 'তোমাকে অনেক বড় হতে হবে, বড় ডাক্তার হতে হবে, বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে'। **এভাবেই টাকার ভিত্তিতে সম্মান নির্ধারিত হওয়ার চিন্তা নিয়ে আমরা বড় হই। কিন্তু ব্যাপারটি এমন নয়। পৃথিবীর একটি ইতিহাস আছে। পৃথিবী চিরকাল এমন ছিল না; পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে গেছে, পৃথিবী বদলে গেছে।** মানুষ বদলে গেছে; মানুষের মন-চিন্তা-চেতনা, হাসি-খুশি-স্বপ্ন সবকিছু বদলে গেছে। কীভাবে বদলে গেছে, তা দীর্ঘ আলোচনার বিষয়[৩]—পৃথিবী একটা সময় কেমন ছিল, আর আজকের পৃথিবী কেমন হয়ে গেছে।

[৩] লেখকের লিখিত 'অবাধ্যতার ইতিহাস' বইটি দেখতে পারেন।

যে অর্থনীতি বুঝল, সে পৃথিবীকে বুঝল। অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল ফাসফেল্ডের একটি বিখ্যাত বই আছে, যেটির বাংলা হচ্ছে 'অর্থনীতিবিদদের যুগ'। এই বইয়ে লেখক বলছেন :

> "**ষোড়শ শতকে এই নতুন শিশু অর্থনীতি (পুঁজিবাদ) থেকে জন্ম নিল নতুন মনোভাব—বাজার-মানসিকতা, যার মূল্যবোধগুলো ভিন্ন ধরনের।**... ধর্মের শিক্ষা ছিল, আর্থিকভাবেও প্রত্যেকে অপরের জন্য দায়ী। বিপরীতে নতুন এই মানসিকতায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন **অন্য সবার চেয়ে ওপরে ওঠা, অপরকে পিছে ফেলা আর টেক্কা দেওয়ার প্রচেষ্টা**। ভ্রাতৃভাবের চেয়ে প্রতিযোগিতাই দরকারি মানসিকতা এই নতুন ব্যবস্থাতে।... ব্যবহারের নৈতিকতার চেয়ে সম্পদ সংগ্রহের দ্বারা মানুষের বিচার হতে লাগল।..."

মানে, ১৫০১-১৫৯৯, এই সময়ে মানুষের মধ্যে এক নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা উদয় হয়েছে, যা মানুষের মূল মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছে। সেই নতুন ব্যবস্থা বা মানসিকতাটা কী? তিনি বলছেন, সেটা হলো 'বাজার-মানসিকতা'। যার মূল্যবোধগুলো, মানে নৈতিকতাগুলো ভিন্ন ধরনের। হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধগুলো ভিন্ন, এতদিন যা ছিল, তেমন না। এতদিন নৈতিকতা ছিল ধর্মভিত্তিক। ধর্মের শিক্ষা ছিল, আর্থিকভাবেও প্রত্যেকে অপরের জন্য দায়ী। সমাজে একজন নারী ক্ষুধার জন্য নিজের ইজ্জতকে বিক্রি করছে, এর জন্য পুরো সমাজই দায়ী হবে। পুরো সমাজের কেউ কেন তাকে সহযোগিতা করেনি যে, সে ক্ষুধা নিবারণের আহার জোগাতে এমন একটা জঘন্য কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এটা কিন্তু ইসলামেও আছে; ইসলামে জাকাত, সদকার ব্যবস্থা রয়েছে গরিবের জন্য। এমনকি, রাষ্ট্রের জরুরি প্রয়োজনে খলিফা চাইলে ধনীদের ওপর আলাদা ট্যাক্স আরোপ করতে পারেন। **সামাজিক নৈতিকতা**র বিষয়ে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের নৈতিক নির্দেশনা, মূল্যবোধ, সামাজিক বন্ধনগুলো কাছাকাছি ধরনেরই।

কিন্তু নতুন জন্ম নেওয়া মানসিকতার মূল্যবোধ কেমন? বলা হচ্ছে, বিপরীতে নতুন এই মানসিকতায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন অন্য সবার চেয়ে ওপরে ওঠা, অপরকে পিছে ফেলা আর টেক্কা দেওয়ার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, তাতে প্রতিযোগিতা আর স্বার্থবাদিতার প্রবণতা প্রাধান্য পাচ্ছে। আরেকজনের কী হলো, তা দেখার বিষয় নয়; অপরের জন্য স্যাক্রিফাইস করা বলতে সেখানে কিছু নেই; বরং আরেকজনকে পেছনে ফেলতে হবে, টেক্কা দিতে হবে।

এরপর ড্যানিয়েল ফ্যাসফেল্ড বলছেন, "...ব্যবহারের নৈতিকতার চেয়ে সম্পদ

সংগ্রহের দ্বারা মানুষের বিচার হতে লাগল।" অর্থাৎ, **একটা সময় পর্যন্ত মানুষের মর্যাদাটা টাকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল না; বরং এই মর্যাদা সম্পর্কযুক্ত ছিল তার জ্ঞান, আচারব্যবহার, গরিবের প্রতি দরদি মানসিকতার সঙ্গে; এগুলো দ্বারা মানুষ সম্মানিত হতো। অতিথিপরায়ণতার দ্বারা মানুষ সম্মানিত হতো। তা ছাড়া, বীরত্ব ও নেতৃত্ব দ্বারাও সম্মানিত হতো।** যেমন আমরা দেখি, আবু সুফিয়ান জাহেলি যুগেও নেতৃত্বের কারণে সম্মানিত ছিলেন। অর্থাৎ, সামাজিক নানারকম ভূমিকায় মানুষ সম্মানিত হতো। কিন্তু ষোড়শ শতকে যে একটা নতুন মানসিকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি, অধিক লাভ করা, মুনাফা করা। কীভাবে অধিক মুনাফা করছি, তা দেখার বিষয় নয়; বরং লাভ করা দরকার, বেশি বেশি ভোগ করা দরকার। এই যে একটা মানসিকতা, এই মানসিকতা থেকেই 'সম্পদ সংগ্রহ দ্বারা মানুষের বিচার হতে থাকল'; অর্থাৎ, টাকা যে যত কামাবে, তার সম্মান তত বেশি; সম্মান বিষয়টিকে টাকার সঙ্গে যুক্ত করে ফেলা হলো। কিন্তু একটা সময় এমনটা ছিল না। তাই আমরা বলতে চাই, **এটা আমাদের প্রকৃতিজাত পদ্ধতি নয়; মানুষের ফিতরাতের সঙ্গে এ পদ্ধতিটা যায় না। বরং এটা আমাদেরকে নতুন করে শেখানো হয়েছে, আমাদেরকে এতে প্রভাবিত করা হয়েছে।**

শিক্ষার উদ্দেশ্য

এখানে আমরা প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার কথা বলতে পারি। Encyclopedia Britannica বলছে—

> The new social and economic changes (এনলাইটেনমেন্ট)[৪] also called upon the schools (public and private) to **broaden their aims** and curricula. Schools were expected not only to promote literacy, **mental discipline**, and **good moral character** (শিক্ষার আগের উদ্দেশ্য) but also to help prepare children for **citizenship, for jobs**, and for **individual development and success**. (পরের উদ্দেশ্য)

[৪] Enlightenment হলো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। এর ফলে ঈশ্বর, যুক্তি, প্রকৃতি এবং মানবতার ধারণা নতুনভাবে তৈরি হয়; যার সম্মিলনে গড়ে ওঠে এক নতুন worldview বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পশ্চিমে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং শিল্প-দর্শন–রাজনীতির ছাঁচ গড়ে দেয়। এই চিন্তাধারার কেন্দ্র হচ্ছে—যুক্তির প্রয়োগ। আর মানুষের মূল লক্ষ্য এখানে—জ্ঞান, স্বাধীনতা আর সুখ।

ফ্রান্সে Voltaire, D'Alembert, Diderot, Montesquieu;

স্কটল্যান্ডে Frances Hutcheson, Adam Smith, David Hume, Thomas Reid;

জার্মানিতে Christian Wolff, Moses Mendelssohn, G.E. Lessing, Immanuel Kant প্রমুখ।

এঁদের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল আরও আগের Hobbes, Locke, Descartes, Bayle, Leibniz, Spinoza-দের চিন্তাকে ঘিরে। [plato.stanford.edu]

অর্থাৎ, নতুন চিন্তা-মানসিকতা আসার পর সামাজিক ও অর্থনৈতিক একটা চেঞ্জ এসেছে। এই পরিবর্তনের ফলে শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আগে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, লিখতে-পড়তে পারা (promote literacy), শৃঙ্খলা শেখানো (mental discipline)। জীবনে কীভাবে চলতে হবে—সেগুলো শেখানো। আর নৈতিক চরিত্র (good moral character) গঠন করা। কিন্তু **সমাজে নতুন যে পরিবর্তন এলো, তাতে এখন শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়ে গেল।** এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল—

১.

নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য যোগ্য নাগরিক তৈরি (citizenship)। মানে, ইউরোপে নতুন সোশ্যাল ও ইকোনমিক চেঞ্জ আসার পরে (যাকে এনলাইটেনমেন্ট বলা হয়) শিক্ষার উদ্দেশ্য পালটে গেল। এনলাইটেনমেন্ট চিন্তাধারার মূল বিষয়গুলো হলো, ধর্মকে পাবলিক লাইফ থেকে, জনপরিসর থেকে দূরে সরিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে আবদ্ধ করে রাখা। ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকবে, এটা রাষ্ট্রে থাকবে না, সমাজে থাকবে না, অর্থব্যবস্থায়ও থাকবে না। এরকম কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় এনলাইটেনমেন্ট যুগের পর। এই যুগের আগে শিক্ষার উদ্দেশ্য যা ছিল, এই যুগের পর তা পরিবর্তিত হয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে গেল, **ধর্মকে বাদ দিয়ে নতুন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি হলো, সেটার জন্য উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা, যে ওই ধর্মহীন ব্যবস্থার জন্য কাজ করবে।**

২.

নতুন অর্থব্যবস্থার (পুঁজিবাদী) জন্য কর্মী তৈরি করা, যারা চাকুরিতে (jobs) **আসবে। চাকুরি করে এই নতুন অর্থব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবে।**

৩.

নতুন সংজ্ঞার 'ব্যক্তি' তৈরি (individual development) **করা।** মানে, আপনি 'ব্যক্তি' (individual/human person) হতে পারবেন তখন, যখন আপনি পূর্ববর্তী যুগের ধর্মীয় ধ্যানধারণা-বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারবেন। এগুলোকে বাদ দিয়ে নিজের যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যখন আপনি চিন্তা করতে শিখবেন, ভালো-মন্দ সবকিছু ধর্ম থেকে নয় বরং

নিজেই ঠিক করতে শিখবেন, তখন আপনি 'ব্যক্তি' হতে পারবেন।[৫]

দর্শনের আলাপ

'ইনডিভিজুয়াল', 'হিউম্যান', 'পারসন'—এগুলো মূলত দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষা। এনলাইটেনমেন্ট যুগে নতুনভাবে যে দর্শন দেওয়া হচ্ছে, নতুনভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গি আনা হচ্ছে, সেখানে বলা হচ্ছে, **জীবনে আদর্শ 'ব্যক্তি' হতে হলে, ধর্মকে ত্যাগ করতে হবে, বা, কম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রাখতে হবে।** এখানে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়াটা সফলতা নয়, বরং দুনিয়ায় সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোগবিলাস করতে পারাটাই হচ্ছে সফলতা।

ষোড়শ শতকে ইউরোপে যারা দার্শনিক ছিলেন, তারা বলছেন যে, 'হিউম্যান পারসন' আপনি তখনই হবেন, যখন আপনি **আগের ধর্মীয় নীতিনৈতিকতা, ধর্মের ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম (বৈধ-অবৈধ) ইত্যাদিকে পাশে রেখে নিজের ভালো-মন্দ, নিজের বৈধ-অবৈধ নিজেই ঠিক করতে পারবেন।** এ-ও বলা হচ্ছে যে, আপনি যখন এমন 'ব্যক্তি' হলেন, তখন আপনার সফলতা আর ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়; বরং তা এই ইহলৌকিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত। এখানকার সফলতাই আপনার সফলতা। আপনি যখন ধর্মের বন্ধন থেকে স্বাধীন হতে পারবেন, নিজের ভালো-মন্দ যখন নিজেই ঠিক করতে পারবেন এবং **এর মাধ্যমে যখন এই দুনিয়ায় সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবেন, তখনই আপনি একজন সফল মানুষ।**[৬] অর্থাৎ, আপনার সফলতার মাপকাঠি পরিবর্তন হয়ে গেল। আগে সফলতার মাপকাঠি ছিল, আমি যদি নীতিনৈতিকতায় ভালো হতে পারি, আচার-আচরণে ভালো হতে পারি এবং এর ফলে পরকালে মুক্তি পেতে পারি, তাহলে আমি সফল। এখন এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ডে এসে তারা বলছে যে, না, আপনি সফল হবেন, যদি আপনি দুনিয়ার জীবনে সর্বোচ্চ ভোগ করে যেতে পারেন, পিতার চেয়ে আরও ওপরের স্তরের ভোক্তা হতে পারেন।

মোটকথা, শিক্ষার আগের উদ্দেশ্য আর এখনকার উদ্দেশ্যের মধ্যে তফাত এসে

---

[৫] 'ব্যক্তি'র (human person) প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বাধীনতা। প্রাণিসত্তাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিসত্তায় যাবার রাস্তা হলো 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতা'। [Jean-Paul Sartre, L'Être et le Néant] একজন লোক 'ব্যক্তি' হতে পারবে, যখন সে নিজের স্বাধীন সিদ্ধান্ত চর্চা করবে। স্বাধীনভাবে নিজের জীবনকে গড়ে নেবে এবং জীবন কীভাবে চালাবে সে নির্দেশনা নিজেই স্বাধীনভাবে দেবে। [Kierkegaard] সে-ই স্বাধীন 'ব্যক্তি' যে নৈতিকতার স্রষ্টা, নিজের নৈতিকতা নিজেই ঠিক করে (creator of values)। স্বাধীন ব্যক্তি আগের কোনো মূল্যবোধকে মেনে নেয় না। সে মূল্যবোধ-নৈতিকতা নিজে ঠিক করে। [Frederick C. Copleston; The Human Person in Contemporary Philosophy, PHILOSOPHY, Vol. 25, No. 92 (Jan. 1950), pp. 3-19]

[৬] জীবনের লক্ষ্য হলো সর্বাধিক সুখ চরিতার্থ করা (ভোগ) এবং সর্বনিম্ন কষ্ট পাওয়া (maximizing pleasure and minimizing pain)। [hedonistic principle, John Locke]

গেছে। এখনকার শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো—

- যোগ্য নাগরিক তৈরি, যারা নতুন ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবে।
- যোগ্য কর্মী তৈরি, যারা নতুন ধর্মহীন অর্থব্যবস্থার জন্য কাজ করবে।
- এবং এমন ব্যক্তি তৈরি, যারা সফলতার নতুন ধর্মহীন সংজ্ঞার জন্য প্রস্তুত হবে।

এই তিনটি হলো নতুন শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এই যে আমরা মাঝে মাঝে বলি, ধর্মশিক্ষাকে কেন বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কেন ইসলাম শিক্ষার পাবলিক পরীক্ষা হবে না, কেন ইসলাম শিক্ষার সঙ্গে আবার নৈতিক শিক্ষা যোগ করা হলো? এগুলো কিন্তু ওই নতুন শিক্ষাব্যবস্থারই অনিবার্য পরিণতি—ধর্মহীন সেকুলার শিক্ষা। শিক্ষার কথা বললাম কারণ, শিক্ষাটা আমাদের ক্যারিয়ারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

তাহলে, এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, টাকার ভিত্তিতে সম্মান—এই ব্যাপারটা/ধারণাটা শুরু হয় ষোড়শ শতক থেকে। একইভাবে, **পড়াশোনার লক্ষ্য যে শুধু চাকরি করা**, এই চিন্তাভাবনাও সে সময়কাল থেকে শুরু হয়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এটার উৎপত্তি হয় ইউরোপে। আর এই ইউরোপীয় ধারণাটা আমাদের দেশে আমদানি হয় ব্রিটিশরা এ দেশ দখল করার পর। তারা শুধু আমাদের দেশই নয়, বরং পুরো মুসলিমবিশ্বকে তারা একসময়ে নিজেদের দখলাধীন করে ফেলেছিল। সে সময়েই তারা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ইউরোপীয় চিন্তা-দর্শনগুলো মুসলিমবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

আমরা দেখতে পেলাম, **সমস্ত সংজ্ঞাই বদলে গেছে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে। মানুষের পুরো জীবনদর্শনই বদলে গেল।** একটা সময়ে যেমন জীবনদর্শন ছিল ধর্মমুখী; খ্রিষ্টধর্মও (তথা, খ্রিষ্টানরাও) ধর্মমুখীই ছিল; তাদের কাছে ধর্মীয় নীতিনৈতিকতার একটা আবেদন ছিল, একটা জায়গা ছিল; এখন আর সেটা নেই। তাহলে আমরা পুরো ব্যাপারটায় ছোট করে একটু নজর বুলিয়ে আসতে পারি। ইউরোপ কীভাবে বদলে গেল, এটা বুঝলেই আমরা কীভাবে বদলে গেলাম, তা বোঝা যাবে।

রেনেসাঁসের সময়েই (১৪৫৩-১৫২৭ সাল) প্রথম বলা হলো :

> এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রবস্তু মানুষ নিজেই; কোনো গড, জেসাস বা ঈশ্বর নয়।

মানুষের জ্ঞান, মানুষের অর্জন ও মানুষের জীবনই সত্য; এর ওপরে আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। তারা বলছেন, "বিশ্বাসের অনুতাপে পুড়ে (অনুশোচনা-তওবা ইত্যাদির মাধ্যমে) নাজাতের মাঝে কোনো মর্যাদা নেই (খ্রিষ্টবাদের চেতনা),

বরং সংগ্রাম ও প্রকৃতিকে জয় করার মধ্যেই মানুষের মর্যাদা।"

দেখুন, কীভাবে তারা সে সময়ে ধর্মকে অস্বীকার করেছে। **সে সময়ে ওই লোকেরা তো খ্রিষ্টান ধর্মকে ডিনাই করেছে; কিন্তু যখন এটা মুসলিম ভূখণ্ডে এসেছে, তখন আমরা এর উসিলায় ইসলামকে ডিনাই করতে শুরু করেছি।** তারা বলেছে, "দুনিয়ার সব কাজকর্মের কেন্দ্রবস্তু মানুষ নিজেই।" আমরাও কিন্তু একই কাজ করেছি। আমরা রাষ্ট্র থেকে 'আল্লাহ'-কে বিদায় করেছি। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সমাজ থেকে 'আল্লাহ'-কে বিদায় করেছি। ক্যারিয়ার, ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্যে হালাল-হারামের কোনো বাছবিচার নেই। আজান হচ্ছে, কিন্তু দোকানি নামাজে যাচ্ছে না। কারণ, তার জীবনে 'আল্লাহ'র তেমন কোনো মূল্য বা গুরুত্ব নেই। বিচারব্যবস্থায় কুরআনের কোনো হুকুম নেই; কারণ, আমরা 'আল্লাহ'-কে বিদায় করে দিয়েছি। কথাগুলো যতই খারাপ লাগুক, কিন্তু বাস্তব সত্য। অর্থাৎ, **এ বিষয়টা আমাদের ভূখণ্ডে আসার পর আমরা হুবহু ইউরোপীয়দের মতোই আচরণ করেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে।**[৭]

এনলাইটেনমেন্ট দর্শনে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের যে দর্শন তাতে আমরা দেখতে পাই, তারা বলছে, "পার্থিব কল্যাণ বা সুখই হলো আরাধ্য, কোনো নাজাত মানবজীবনের সার্থকতা নয়। মানুষ স্বভাবগতভাবেই স্বার্থপর; তাই, এমন পরিবেশ করে দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থ সর্বোচ্চ মাত্রায় চরিতার্থ করতে পারে।"

আমরা এখন যে আলোচনা করছি, তা কিন্তু আমাদের ক্যারিয়ারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শুরুতে বিভিন্ন অভিধান থেকে ক্যারিয়ারের যে ডেফিনেশন/সংজ্ঞা আমরা উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে এ কথাগুলো মিলিয়ে দেখুন। তারা বলছেন, পার্থিব কল্যাণ বা সুখই আরাধ্য। এটাই আমাদের টার্গেট; কোনো জান্নাত-টান্নাত ইত্যাদি পাওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়।[৮]

এই দর্শনের বিষয়গুলো আমাদের ক্যারিয়ারের সঙ্গে যুক্ত। ক্যারিয়ার আমরা কেন গড়ি? দেখা যাচ্ছে, ক্যারিয়ারের বিষয়ই হচ্ছে এটা যে, সর্বাধিক সুখ চরিতার্থ করা,

[৭] আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন, "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে, গজে গজে। এমনকি তারা যদি সান্ডার (গুইসাপসদৃশ প্রাণী) গর্তে ঢুকে, তাহলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।" সাহাবিরা বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, পূর্ববর্তী বলতে কি ইহুদি-নাসারা উদ্দেশ্য?" তিনি বললেন, "তারা ব্যতীত আর কারা?"—সহিহ বুখারি : ৩৪৫৬; সহিহ মুসলিম : ২৬৬৯

[৮] রাষ্ট্রের কাজ হলো : সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ (ভোগ) নিশ্চিত করা (greatest good for the greatest number)। [utilitarianism, Jeremy Bentham]

আরও ভালো থাকা এবং সর্বনিম্ন কষ্ট পাওয়া। **এই যে একজন ব্যক্তির চিত্র আমরা দেখলাম, যে স্বার্থপর, ধর্ম থেকে স্বাধীন, নিজেই নিজের নৈতিকতার স্রষ্টা—এর ক্যারিয়ার কেমন হবে? আর বিপরীতে একজন মুসলিমের ক্যারিয়ার কেমন হওয়ার কথা?** পার্থক্যটা আমরা ধরতে পারছি?

আমরা এতক্ষণ যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম, এগুলোর সবটাই কিন্তু বর্তমানে আমরা ব্যক্তিগতভাবে মনের মধ্যে লালন করি। "সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই।" ধর্মের কথা যখন কেউ বলতে যায়, তখন বলি, "রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এগুলো চলবে না; রাষ্ট্র চলবে রাষ্ট্রের আইনে; ধর্মের আইন মধ্যযুগীয়, এগুলো পুরনো-সেকেলে হয়ে গেছে, অকেজো হয়ে গেছে, সেগুলো এখানে চলবে না।" এ কথাগুলো কিন্তু আমরা প্রায়ই বলি বা শুনি। তাহলে বোঝা গেল, **এনলাইটেনমেন্ট যুগে মানুষের যে নতুন সংজ্ঞা, এর ফলে একজন মানুষের সংজ্ঞা যেমন হবে, তার ক্যারিয়ারও তেমন হবে।** এজন্য দেখবেন যে, মানুষ চাকরি বা ব্যবসার জন্য সবকিছু করতে রাজি। সুদের কারবার, হালাল-হারামের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ফলমূলে ফরমালিন মেশাচ্ছে, মজুদ রেখে জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে, গরিব মানুষকে কষ্টে ফেলে দিচ্ছে, খাদ্যদ্রব্যে বিষতুল্য পদার্থ মিশিয়ে দিচ্ছে। আরও কত কী! 'প্রাণ' যখন আপনাকে ফ্রুটিকা খাওয়াচ্ছে, তখন আমের জুসে আমের বদলে কুমড়োর জুস দিয়ে দিচ্ছে; নানা ধরনের কেমিক্যাল মিশিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ, কোথাও কোনো নৈতিকতা আপনি দেখবেন না। এর পেছনে কারণ হলো, **মানুষের ওই নতুন সংজ্ঞা, যার প্রবক্তা হলো ইউরোপীয় দার্শনিকেরা।**